

Session 06

ইসলামে পোশাক-পরিচ্ছেদ

প্রারম্ভিকা:

ইসলাম নির্দেশিত পোশাক পরা নিছক কোনো সংস্কৃতি নয়, কোনো দলের বা মতের ইউনিফর্ম নয়, এটা সুস্পষ্ট ইবাদত। যা পালনে রয়েছে সওয়াব ও পালন না করলে রয়েছে নিন্দা বা জাহান্নাম। কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রের নিয়ম দ্বারা এ ইবাদত সীমাবদ্ধ হবে না। ইসলামে অনুমোদিত সব পোশাকই ইসলামী। কোনো সন্ত্রাসী, বেদ্বীন কাফির-মুশরিক যদি ইসলামের পোশাক পরে কোনো অপকর্ম করে তবে সে দায় ইসলাম ও মুসলমানের নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পোশাক পরিধানের হুকুম দুটি। ১. ফরজ এবং ২. উত্তম ও বৈধ। ফরজ পোশাক পরতে যদি কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সমাজ বা রাষ্ট্র বাধা দেয় তবে তা মানা যাবে না। সে ক্ষেত্রে হয় তার প্রতিবাদ করতে হবে নচেত সে স্থান পরিত্যাগ করতে হবে। দ্বিতীয় হুকুম অনুযায়ী উত্তম বলতে ইসলামের মডেল ও আদর্শ মুহাম্মদ সা:-এর কাটিং ও ডিজাইনে পোশাক পরিধান করা এবং বৈধ বলতে ইসলামে নিষেধ নয় এমন পোশাক পরিধান করা। বিষয়টি ব্যক্তির ঈমানি জোর, ব্যক্তিগত রুচিবোধ ও ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে তার আবেগ ও অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল।

হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘যদি কেউ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে; তবে সে ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।’ (আবু দাউদ)

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে- খ্রিস্টানদের টুপি, হিন্দুদের ধুতি এবং বৌদ্ধদের গেরুয়া কাপড়ের তৈরি পোশাক। এ ধরনের পোশাক পরিধান করা মুসলমানদের জন্য ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ।

পোশাকের গুরুত্ব :

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যেসব নে‘মত দান করেছেন, পোশাক তার মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَرْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا، وَلِبَاسُ النَّفَقَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ-

‘হে আদাম সন্তান! আমরা তোমাদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়েছি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য এবং শোভা বর্ধনের জন্য। আর তাকওয়ার পোশাক হচ্ছে সর্বোত্তম। ওটা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে’ (আ‘রাফ ৭/২৬)।

পোশাক সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

‘হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ছালাতের সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ কর। আর খাও, পান কর কিন্তু অপচয় করো না। অবশ্যই তিনি অপচয়কারীদেরকে পসন্দ করেন না’ (আ‘রাফ ৭/৩১)। সুন্দর

পোশাক পরিধান সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَلَّا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ ، قَلَّا رِئَالًا ۖ الرِّئَالُ يُحِبُّ ۖ يَكُونُ ۖ ثَوْبُهُ ۖ سَنَّا ۖ وَغُلَّهُ ۖ سَنَّةً. قَلَّا ۖ اللَّهُ ۖ مِثْلُ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ.

‘যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বলল, মানুষ তো পসন্দ করে যে তার পোশাক সুন্দর হোক এবং তার জুতা সুন্দর হোক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন। অহংকার হ’ল হককে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা’। (মুসলিম হা/৯১; আবু দাউদ হা/৪০৯২; তিরমিযী হা/১৯৯৯; মিশকাত হা/৫১০৮।)

পোশাকের প্রকার : ইসলামী শরী‘আতে পোশাক তিন প্রকার। যথা- ওয়াজিব, মুস্তাহাব ও হারাম।

ওয়াজিব পোশাক : যে পোশাক সতর আবৃত করে, গরম ও শীত থেকে শরীরকে রক্ষা করে এবং স্ফুটি থেকে দেহকে হেফাযত করে সে পোশাক ওয়াজিব।

عَنْ بَهْزِ بْنِ كَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دِهْ قَالَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا أَتَى مِنْهَا وَمَا ذُرُّ قَالَا قَطُّ عَوْرَتِكَ إِلَّا مِنْ رَوْقٍ تَكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَلَا الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَا ۖ اسْتَطَعْتُ ۖ لَا يَرِيْنَهَا ۖ قَالَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَلَا ۖ قَالَا خَالِيَا قَالَا اللَّهُ أَقْبَى ۖ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.

বাহয বিন হাকিম তার পিতা হ’তে তিনি তার দাদা হ’তে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাদের আবরণীয় অঙ্গসমূহ কার সামনে আবৃত রাখব এবং কার সামনে অনাবৃত করতে পারি? তিনি বললেন, তোমার স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত সকলের সামনে তা আবৃত রাখ। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অনেক লোক যখন পরস্পর একসাথে থাকে? তিনি বলেন, যতদূর সম্ভব কেউ যেন অন্যের গোপন অঙ্গের দিকে না তাকায়। রাবী বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কেউ যখন নির্জনে থাকে? তিনি বলেন, লজ্জার ব্যাপারে আল্লাহ মানুষের চাইতে বেশী হকদার’। (আবু দাউদ হা/৪০১৭; ইবনু মাজাহ হা/১৯২০; তিরমিযী হা/২৭৬৯; মিশকাত হা/৩১১৭, সনদ হাসান।)

মুস্তাহাব পোশাক : যে পোশাকে সৌন্দর্য আছে, তা মুস্তাহাব পোশাক।

عَنْ أَبِي الْأَوْصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ دُونَ فَقَالَ أَلَيْكَ مَا؟ قَالَ عَمَّ. قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَلِكِ. قَالَ قَدْ أَتَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْعَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ قَالَ فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْ أَنْتَرُ عَمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ.

আবুল আহওয়াছ স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি নিম্নমানের পোশাক পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হ'লাম। তা দেখে তিনি বললেন, তোমার কি ধন-সম্পদ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কী ধরনের সম্পদ? আমি বললাম, আল্লাহ আমাকে উট, ভেড়া, ঘোড়া ও দাস-দাসী দিয়েছেন। তিনি বললেন, তাহ'লে আল্লাহ যখন তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তখন তোমার বেশ-ভূষায় আল্লাহর নে'মতের নির্দশন ও করুণা প্রকাশ পাওয়া উচিত'। (আবূদাউদ হা/৪০৬৩; মিশকাত হা/৪৩৫২, সনদ ছহীহ।)

বিভিন্ন ইবাদতের সময়, জুম'আ, দু'ঈদ ও জনসমাবেশে সুন্দর পোশাক পরার গুরুত্ব অত্যধিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذْ دَأَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ وَدَثْمٌ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْنِ مَهْنَتِهِ. 'তোমাদের কারো সামর্থ্য থাকলে সে যেন তার পেশাগত কাজে ব্যবহৃত পোশাক ব্যতীত জুম'আর দিনের জন্য এক জোড়া পোশাক তৈরী করে'। (আবূদাউদ হা/১০৭৪; ইবনু মাজাহ হা/১০৯৬; মিশকাত হা/১৩৮৯, সনদ ছহীহ।)

হারাম পোশাক : বিভিন্ন কারণে ইসলামে কতিপয় পোশাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলো হ'ল-

১. পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক ও স্বর্ণ মিশ্রিত পোশাক।
২. পুরুষের জন্য মহিলাদের পোশাক
৩. মহিলাদের জন্য পুরুষদের পোশাক
৪. খ্যাতি ও বড়াই প্রকাশক পোশাক
৫. ভিন্ন ধর্মীয় পোশাক
৬. আঁটসাঁট পোশাক প্রভৃতি।

নিম্নে পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয়ে ইসলামের আটটি নির্দেশনা তুলে ধরা হলো— পোশাক পরিধানে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা: পোশাক-পরিচ্ছদ আল্লাহ তাআলার দেওয়া এক বড় নিয়ামত। তাই প্রতিটি বান্দার উচিত পোশাক পরিধানে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহর রাসূল (সা.) যখন কোনো নতুন কাপড় পরিধান করতেন তখন আল্লাহর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই দোয়া পাঠ করতেন, اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَتَتْ كَسَوْنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ» অর্থ : “হে আল্লাহ! সব প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনিই আমাকে এ পোশাক পরিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ ও এটি যে উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করি। আর আমি এর অনিষ্ট এবং এটি যে জন্য তৈরি করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই।

সতর আবৃত করা: পোশাক-পরিচ্ছদ এমন হতে হবে, যা পুরো সতর আবৃত করে। পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত আর নারীর পুরো শরীর সতর। পোশাকের মূল উদ্দেশ্যই সতর ঢাকা। পোশাক প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছি পোশাক, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং সৌন্দর্য দান করে।’ (সুরা: আরাফ, আয়াত: ২৬) সুতরাং যে পোশাক এই উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ, তা যেন শরিয়তের দৃষ্টিতে পোশাকই নয়! নারী-পুরুষ স্বতন্ত্র পোশাক পরিধান করা: হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুল (সা.) অভিসম্পাত করেছেন ওই পুরুষকে যে নারীর পোশাক পরে এবং ওই নারীকে যে পুরুষের পোশাক পরে। (আবু দাউদ, হাদিস: ৪০৯৮)

খ্যাতির আশায় পোশাক না পরা: প্রতি ঈদ বাজারে পোশাক কারখানাগুলো পরিচিত মডেল এবং টিভি সিরিয়ালের নামে বাহারি পোশাক বাজারজাত করে থাকে। আর উঠতি ছেলে-মেয়েদের এসব পোশাকের প্রতি থাকে বাড়তি আগ্রহ। অথচ রাসুলুল্লাহ (সা.) এসব পোশাক না পরার ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, ‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধির পোশাক পরবে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন। অতঃপর তাকে অগ্নিদগ্ধ করা হবে।’ (আবু দাউদ, হাদিস: ৪০২৯)

পোশাক পরিধানে কৃপণতা না করা: অপচয় ও কৃপণতা সর্বক্ষেত্রেই নিন্দনীয়। পোশাক-পরিচ্ছদেও এর ব্যতিক্রম নয়। সামর্থ্য থাকার পরও কেউ যদি কৃপণতা করে নিম্নমানের পোশাক পরিধান করে ইসলামে তাদের অপছন্দ করা হয়েছে। একবার আবুল আহওয়াসের পিতা মালিক বিন আউফ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এলেন। তখন তাঁর পরনে ছিল অতি নিম্নমানের পোশাক। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি সম্পদ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, কী সম্পদ আছে? আমি বললাম, সব ধরনের সম্পদই আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া, গোলাম ইত্যাদি। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, ‘যখন আল্লাহ তাআলা তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন তখন তোমার ওপর তাঁর নিয়ামতের ছাপ থাকা চাই।’ (নাসাঈ, হাদিস: ৫২৯৪)

পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখা: পোশাক-পরিচ্ছদ দ্বারা সতর আবৃত করার পাশাপাশি নিয়মিত পরিষ্কার-পরিপাটি রাখা ইসলামের নির্দেশনা। সাহল বিন হানজালিয়া (রা.) বলেন, কোনো এক সফর থেকে ফেরার পথে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রিয় সাহাবাদের লক্ষ করে বলেন, ‘তোমরা তোমাদের ভাইদের কাছে আগমন করছ। সুতরাং তোমাদের হাওদাগুলো গুছিয়ে নাও এবং তোমাদের পোশাক পরিপাটি করো, যাতে তোমাদের (সাক্ষাৎ করতে আসা) মানুষের ভিড়ে তিলকের মতো (সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন) মনে হয়। (জেনে রেখো) আল্লাহ তাআলা স্বভাবগত নোংরামি বা ইচ্ছাকৃতভাবে নোংরা থাকা, কোনোটাই পছন্দ করেন না।’ (আবু দাউদ, হাদিস: ৭০৮৩)

প্রদর্শনের মানসিকতা পরিহার করা: অহংকার বা মানুষ দেখানোর মানসিকতা সর্বাবস্থায় সকল কাজেই নিন্দনীয়। পোশাক-পরিচ্ছদের মাধ্যমেও যেন এই ব্যাধি মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়েও হাদিস শরিফে বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। এক হাদিসে নবী করিম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত মাটিতে কাপড় টেনে টেনে চলে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না (রাগান্বিত থাকবেন)। (বুখারি, হাদিস: ৫৭৯১)

বিধর্মীদের পোশাক না হওয়া: বিধর্মীদের অনুকরণে পোশাক পরিধান করা নাজায়েজ। হাদিসে এসেছে, ‘যে ব্যক্তি অমুসলিমদের পোশাক পরবে সে আমার দলভুক্ত নয়।’ (তবারানি আওসাত,)

পুরুষের পোশাক সংক্রান্ত বিধি-বিধান

১. পরিধানযোগ্য সব পোশাকের মূল বিধান হচ্ছে- বৈধতা। যদি না কোন পোশাক হারাম হওয়ার পক্ষে দলিল থাকে; যেমন- পুরুষদের জন্য রেশমের কাপড় পরা। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয় এ দুটো জিনিস আমার উম্মতের পুরুষদের উপর হারাম (নিষিদ্ধ), নারীদের জন্য জায়েয (বৈধ)।”[সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৬৪০), আলবানী সহিহ সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন] যেমন- মৃতপ্রাণীর চামড়া পরিধান করা অবৈধ; তবে দাবাগত করলে তথা প্রক্রিয়াজাত করলে বৈধ। আর ভেড়া, উট ও ছাগলের পশম দিয়ে তৈরী পোশাক এর বিধান হচ্ছে- এগুলো পবিত্র ও বৈধ।

২. স্বচ্ছ পোশাক পরিধান করা অবৈধ; যে পোশাকে সতর ঢাকে না।

৩. পোশাকাদির ক্ষেত্রে কাফের ও মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম। তাই যে সব পোশাক কাফেরদের নিজস্ব পোশাক সেগুলো পরিধান করা নাজায়েয।

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কুসুম রঙ-এর দুটো কাপড় পরিহিত দেখে বললেন: এগুলো কাফেরদের পোশাক। তাই, তুমি এগুলো পরিধান করো না।[সহিহ মুসলিম (২০৭৭)]

৪. পোশাকের ক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য নারীদের বেশ ধারণ করা এবং নারীদের জন্য পুরুষদের বেশ ধারণ করা হারাম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষ ও পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী নারীদেরকে লানত করেছেন।[সহিহ বুখারী (৫৫৪৬)]

৫. সুন্নত হচ্ছে- যে কোন মুসলিম বিসমিল্লাহ বলে ডান দিক থেকে কাপড় পরা শুরু করবে এবং বাম দিক থেকে কাপড় খোলা শুরু করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন তোমরা পোশাক পরবে কিংবা ওয়ু করবে তখন

ডান দিক থেকে শুরু কর।”[সুনানে আবু দাউদ (৪১৪১), আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৭৮৭) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন।

৬. নতুন পোশাক পরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ও দোয়া করা সুন্নত। আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোনো নতুন কাপড় পরিধান করতেন, তখন এই পোশাকের নাম উল্লেখ করতেন; যেমন- পাগড়ি বা জামা কিংবা চাদর। তারপর বলতেন:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَتَى كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ
(অর্থ :হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনিই আমাকে এ পোশাক পরিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ ও এটি যে উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে সে কল্যাণ প্রার্থনা করি। আর আমি এর অনিষ্ট এবং এটি যে জন্য তৈরি করা হয়েছে সেটার অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই।)[সুনানে তিরমিযি (১৭৬৭), সুনানে আবু দাউদ (৪০২০), শাইখ আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

৭. অহমিকা ও অতিরঞ্জন বর্জন করে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি যত্নবান হওয়া সুন্নত। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক লোক বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষ তো পছন্দ করে তার কাপড়টি সুন্দর হবে, তার জুতাটি সুন্দর হবে। তিনি বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে- সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা।”[সহিহ মুসলিম (৯১)]

৮. সাদা রঙের পোশাক পরিধান করা মুস্তাহাব। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করো। কেননা সাদা পোশাক সর্বোত্তম পোশাক। এবং সাদা পোশাকে তোমাদের মৃতব্যক্তিদেরকে কাফন দাও।”[সুনানে তিরমিযি (৯৯৪) হাসান সহিহ, আলেমগণ সাদা রঙের পোশাক পরাকে মুস্তাহাব বলেন; সুনানে আবু দাউদ (৪০৬১) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (১৪৭২)]

৯. পরিধেয় যে কোন পোশাকের সর্বোচ্চ সীমা টাকনু পর্যন্ত; কোন পোশাককে টাকনুর নীচে প্রলম্বিত করা হারাম। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: “লুঙ্গির যতটুকু টাখনুর নীচে যাবে ততটুকু জাহান্নামে যাবে।”[সহিহ বুখারী (৫৪৫০)] আবু যর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “আল্লাহ কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আবু যার (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এ কথাটি তিনবার বলেছেন। আবু যার (রাঃ) বলেন: তারা ব্যর্থ হোক ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক। ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা কারা? তিনি বললেন: লুপ্তি প্রলম্বিতকারী, খোঁটা দানকারী ও মিথ্যা শপথ করে পণ্যসামগ্রী বিক্রয়কারী। [সহিহ মুসলিম (১০৬)]

১০. ‘যশোদ-পোশাক’ পরিধান করা হারাম। সেটা এমন পোশাক যা পরিহিতকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে; যাতে করে তার দিকে চোখ তুলে তাকানো হয়, তার পরিচিতি লাভ হয় এবং খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি যশোদ-পোশাক পরবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে অনুরূপ পোশাক পরাবেন।” অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, “এরপর তাকে আগুনে পোড়ানো হবে”। অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরানো হবে”।

নারীদের পোশাক সংক্রান্ত বিধিবিধানঃ

কোরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলামবেত্তাগণ মুমিন নারীর পোশাকের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, তার কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হলো—

১. শরীর ও সৌন্দর্যকে আড়াল করবে : মুমিন নারীর পোশাকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, তা তার শরীর ও সৌন্দর্যকে আড়াল করবে। যেন তা পুরুষের কামুক দৃষ্টির শিকার না হয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না, তবে যা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায়।’ (সুরা নূর, আয়াত : ৩১)

২. খুব বেশি পাতলা বা মোটা হবে না : মুমিন নারী এমন পাতলা পোশাক পরিধান করবে না, যা পরিধানের পরও শরীর দেখা যায়। আত্ম প্রকাশ পায়। আবার এমন মোটা পোশাক পরিধান করবে না, যাতে গরমে তার কষ্ট হয়; বরং অস্বচ্ছ মধ্যম পোশাক পরিধান করবে। একাধিক হাদিসে অতিরিক্ত পাতলা পোশাক পরিধানকে কেয়ামতের নিদর্শন বলা হয়েছে।

৩. ঢিলেঢালা হবে : ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কে ঢিলেঢালা পোশাক পরিধানের নির্দেশ দিয়েছে। শরীরের অবয়ব প্রকাশ পায়—এমন আঁটসাঁট পোশাক মুমিন পুরুষও পরিধান করবে না। আর নারী তো নয়ই। কেননা এমন পোশাক অন্যকে প্রলুব্ধ করতে পারে। অনেক সময় তা বোরকা, হিজাব ও পর্দার উদ্দেশ্যকেও ব্যাহত করে।

৪. পুরো শরীর ঢেকে রাখবে : ইসলাম নারীকে এমন পোশাক পরিধান করতে বলেছে, যা তার পুরো শরীরকে ঢেকে রাখবে। শরীর বের হয়ে থাকে—এমন পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিনদের স্ত্রীদের বলে

দিন, যেন তাদের চাদর নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে এবং তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' (সূরা আহজাব, আয়াত : ৫৯)

আলোচ্য আয়াতে ইসলাম নারীকে যে শালীন ও সংযত পোশাক পরিধান করতে বলেছে, তার কারণ বিবৃত হয়েছে। তা হলো, পুরুষের কামুক দৃষ্টি, অশালীন মন্তব্য ও যৌন সহিংসতা থেকে নারীকে রক্ষা করা।

৫. পুরুষের পোশাকের মতো হবে না : ইসলাম নারীকে নারীসুলভ এবং পুরুষকে পুরুষসুলভ পোশাক পরিধানের নির্দেশ দিয়েছে। শরিয়তের বিধানমতে, নারী যেমন পুরুষের পোশাক পরিধান করবে না, তেমন পুরুষও নারীর মতো পোশাক পরিধান করবে না। উভয় পোশাক ও সাজসজ্জা হবে ভিন্ন ভিন্ন। রাসুলুল্লাহ (সা.) মুমিন নারী-পুরুষকে সতর্ক করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) নারীর বেশভূষা গ্রহণকারী পুরুষকে এবং পুরুষের বেশভূষা গ্রহণকারী নারীকে অভিশাপ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাদের তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৫৮৫)

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) নারীর সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষকে এবং পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণকারী নারীকে অভিশাপ করেছেন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৬৩১)

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের পোশাকগুলোই মূলত নারীর জন্য আল্লাহতীতির পোশাক। ইসলাম মুমিন নারীকে এমন পোশাক পরিধানেরই নির্দেশ দেয়।

Session 07.

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

"শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান" কথাটির অর্থ গভীর ও ব্যাপক। ভেদাভেদ ভুলে সকলে একসাথে মিলেমিশে আনন্দের সাথে থাকা, ভয় থেকে মুক্তিলাভ ও মানুষের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্প্রীতি স্থাপন করাই হলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। একত্রে বা ঐক্যে বসবাস করলেই শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় না, কিন্তু শান্তিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনায় বাস্তব জীবন যাপন করতে হবে। শান্তিপূর্ণ আচরণের কারণে মনের মধ্যে শান্তি লাভ করি। মনের শান্তি, পারিবারিক শান্তি ও সামাজিক শান্তি ছাড়া সহাবস্থান সম্ভব নয়। পারিবারিক শান্তি, খ্রীষ্টমণ্ডলী ও সমাজে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাই পারিবারিক শান্তি একান্তভাবে প্রয়োজন। যেখানে সহযোগিতা ও ত্যাগ স্বীকার থাকে সেখানে একত্রে বাস করা সহজ হয়। মানুষের মন যখন শান্ত ও সন্তুষ্ট থাকে তখন শান্তিতে সহাবস্থান সম্ভব হয়।

সহাবস্থানের জন্য পরিবার, কৃষ্টি, ভাষা, জাতি, প্রতিবেশী ও দেশ পরস্পরের সাথে গ্রহণযোগ্য সম্পর্ক থাকা দরকার। সহাবস্থানে থাকার জন্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সম্প্রীতি ও সমঝোতা থাকা প্রয়োজন। মানুষের প্রতি মানুষের সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ থাকা গুরুত্বপূর্ণ। যীশু বলেছেন, "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো প্রেম করবে" (লুক ১০:২৭)। শান্তির জন্য সহনশীলতা, ধৈর্য, মিল, ঐক্য ও সমন্বয় থাকতে হবে। তার জন্য একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, গ্রহণ ও মেনে নেয়ার মধ্যদিয়ে শান্তিতে থাকা সম্ভব।

ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম। ভিন্ন ধর্মের ব্যাপারে উদার ও সহানুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সব ধর্মের ও অনুসারীদের নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম মানে শান্তি, ইমান মানে নিরাপত্তা। ইসলামের উদ্দেশ্য ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন নিরাপত্তা। ইসলামের জীবনাদর্শ বিশ্বের সব মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য। পৃথিবীর সব মানুষের ব্যক্তি জীবন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ইসলামের লক্ষ্য।

বিশ্বশান্তি ও ধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য প্রয়োজন মানবাধিকার সংরক্ষণ। ইসলাম ব্যক্তি মানুষের সম্মানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংরক্ষণ করে। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সব মানুষ ভাই ভাই কারণ সবাই একই পিতা-মাতার সন্তান। আল্লাহতাআলা বলেন, হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো যিনি তোমাদের এক প্রাণ থেকে সৃজন করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন; এরপর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী সম্প্রসারণ করেছেন। ইসলাম ভৌগোলিক, আঞ্চলিক, নৃতাত্ত্বিক, জাতিগত প্রভেদে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সমর্থন করে না। ইসলামে কোনো প্রকার শ্রেণিবৈষম্য নেই, নেই কোনো অস্পৃশ্যতার স্থান।

ইসলাম মানুষকে জাতি ও বর্ণ দিয়ে বিচার করে না; বরং তার বিশ্বাস ও কর্মের মূল্যায়ন করে। আল্লাহতাআলা বলেন হে মানবজাতি! আমি তোমাদের এক নর ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি অতঃপর তোমাদের বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছি; যাতে তোমরা একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে অধিক সম্মানিত যে অধিক সতর্ক ও সংযত। ইমান বা বিশ্বাস হলো আদর্শ ও জীবনব্যবস্থার মূল ভিত্তি। ইমান আনার ক্ষেত্রে ইসলামে বল প্রয়োগের বা জবরদস্তির কোনো সুযোগ নেই। মানুষের কাছে সত্য ও মিথ্যার, ন্যায় ও অন্যায়ের,

হেদায়াত ও গোমরাহির বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা ছিল নবী-রাসুলদের দায়িত্ব। ইমান আনা না-
আনার বিষয়টি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহতাআলা বলেছেন
দীনের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই, সত্য ভ্রান্তি থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার
করবে আর আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙার নয়।
আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়। (সুরা-বাকারা: ২৫৬)

ইসলাম শান্তি, মৈত্রী ও সম্প্রীতির ধর্ম। সহনশীলতা, নিরপেক্ষতা ও সহমর্মিতা এর পরম বৈশিষ্ট্য।
এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। আল্লাহ এক ইসলামের এই মতবাদই ইসলামকে সহিষ্ণু
করেছে। মুসলমানরা এ কথা বিশ্বাস করে যে মানুষ অসম্পূর্ণতা নিয়ে জগতে এসেছে। যারা দেব-
দেবীর পূজা-অর্চনা করে তারা বিপথগামী ঠিক; তবু সেই এক খোদারই সৃষ্টি। তাই তারাও
মুসলমানদের ভ্রাতৃস্থানীয়। তাদেরকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব মুসলমানদের। কিন্তু যতদিন
তারা স্বেচ্ছায় মুক্তির পথ বেছে না নেবে, ততদিন সহজভাবেই তাদেরকে তাদের ইচ্ছের ওপর ছেড়ে
দিতে হবে।

বিশ্বাস মানুষের অন্তরের বিষয়, কর্মে তা কখনো প্রকাশ পায় আবার কখনো প্রকাশ পায় না। বিশ্বাস
গড়ে ওঠে জ্ঞানের আলোয়; বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এ জন্যই যার যার বিশ্বাস তার তার,
কারও বিশ্বাস নিয়ে বিদ্রূপ, কটুক্তি বা কটাক্ষ করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, গাল-মন্দ ইসলামে
হারাম। আল্লাহতাআলা বলেন, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে, তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো
না, ফলে তারা গালমন্দ করবে আল্লাহকে, শত্রুতা পোষণ করে অজ্ঞতাবশত। এভাবেই আমি প্রত্যেক
উম্মতের জন্য তাদের কর্ম শোভিত করে দিয়েছি। তারপর তাদের রবের কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন।
অতঃপর তিনি জানিয়ে দেবেন তাদেরকে, যা তারা করত। (সুরা আনআম: ১০৮)

মুসলিম বিশ্বাসে ইসলাম চূড়ান্ত ধর্ম ও জীবনবিধান হলেও ইসলামী শরিয়ত সমাজে ধর্মীয় সম্প্রীতি
ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ইসলাম মানুষকে অভিন্ন
মানবিক অধিকার ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াতে মহান আল্লাহ
মানবজাতিকে মানবিক মূল্যবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। পবিত্র
কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, হে মানুষ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে
আর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত

হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব খবর রাখেন। (সূরা হুজরাত: ১৩)

ইসলাম কখনোই সাম্প্রদায়িক হামলা এবং অন্য ধর্মের লোকদের প্রতি অবিচার করাকে সমর্থন করে না। সমাজ ও রাষ্ট্রকে অশান্তি, জুলুম ও বিশৃঙ্খলামুক্ত করার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে বলেই ইসলাম শান্তির ধর্ম। মানুষ যদি শান্তি পেতে চায় তাহলে তার নিজের ইচ্ছেমতো জীবনযাপন না করে আল্লাহর দেয়া বিধান মেনে চলতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে নেয়া যে জীবনাদর্শের লক্ষ্য তারই নাম ইসলাম। জীবনের প্রতিক্ষেত্র, প্রতিস্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধিনিষেধ পালন করা তার সম্ভ্রুষ্টি অন্বেষণ করা এবং এ লক্ষ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়ার নামই ইসলাম। আল্লাহ সবাইকে সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও সংবেদনশীলতা দান করুন।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণাটি তৈরি করেছিল কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সাথে এবং চীনের ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক শক্তিগুলির সাথে সহাবস্থানের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে। এটি পারস্পরিক বিরোধী আগ্রাসনের তত্ত্বের সাথে সরাসরি বিপরীত ছিল যা মনে করা হয়েছিল যে দুটি শাসন শান্তিতে থাকতে পারে না। যদিও এটি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন দ্বারা ভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক 1950 এবং 1960 এর দশকে চীন-সোভিয়েত বিভক্তির একটি দিককে অবদান রেখেছিল। শীতল যুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে, মধ্যপ্রাচ্যে আরব-ইসরায়েল দ্বন্দ্বের প্রস্তাবিত সমাধান বর্ণনা করতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ব্যবহার করা হয়েছে, 1990-এর দশকের শেষের দিকে এশিয়ার আর্থিক সংকটের পর আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতার ওয়াল স্ট্রিটের দৃষ্টিভঙ্গি, পশ্চিমের মধ্যে সম্পর্ক এবং ইসলাম, ইহুদি এবং খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক এবং বিভিন্ন খ্রিস্টান চার্চের মধ্যে সম্পর্ক। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণাটি অনেক আন্তর্জাতিক নথি দ্বারা গৃহীত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত আদর্শ হয়ে উঠেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাখ্যা

ভ্লাদিমির লেনিন, বিপ্লবী নেতা, কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, 1917 সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর প্রথম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণাটি তুলে

ধরেন। সেই সময়ে তিনি শান্তির উপর একটি ডিক্রি জারি করেছিলেন যা বিশ্বকে আহ্বান করেছিল। যুদ্ধ I (1914 - 1918) অংশগ্রহণকারীরা অবিলম্বে শান্তির জন্য আলোচনা শুরু করে। লিওন ট্রটস্কি, পিপলস কমিসার অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স, সমস্ত মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি সরকারী মতবাদ ঘোষণা করে এই ডিক্রি অনুসরণ করেছিলেন। যাইহোক, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম দিকে বিশ্ব বিপ্লবের মতবাদও ঘোষণা করা হয়েছিল, বিশেষ করে লেনিন। দুটি নীতি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং বিশ্ব বিপ্লব, কয়েক দশক ধরে দ্বন্দ্ব দেখা দেবে।

1943 সালে জোসেফ স্টালিন কমিন্টার্নকে বিলুপ্ত করেন এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালকে ভেঙে দেন, বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির একটি মস্কোভিত্তিক সংগঠন- যা বিপ্লবকে উন্নীত করেছিল। এই পদক্ষেপটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (1939 - 1945) পশ্চিমা মিত্রদের সন্তুষ্ট করার এবং একটি যুদ্ধকালীন চুক্তি সুরক্ষিত করার একটি প্রচেষ্টা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির একটি অংশ হিসাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আনুষ্ঠানিক গ্রহণের অগ্রদূত ছিল। 1949 সালে, এখনও স্টালিনের নেতৃত্বে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিকভাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণাকে প্রচার করার জন্য একটি বিশ্ব শান্তি আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য বিশ্ব শান্তি পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে। এটি পশ্চিমা উদ্বেগগুলিকে প্রশমিত করার জন্য বোঝানো হয়েছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্ব বিপ্লব দ্বারা চালিত হয়েছিল, যেমন বলশেভিকদের দ্বারা সমর্থন করা হয়েছিল।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতম কংগ্রেসের পর নিকিতা ক্রুশ্চেভ সর্বপ্রথম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা ঘোষণা করেছিলেন যখন তিনি স্ট্যালিনের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের নিন্দা করেছিলেন। সোভিয়েত প্রিমিয়ার হিসাবে, 1953 সালে শুরু করে ক্রুশ্চেভ পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনার আলোকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা কমানোর উপায় হিসাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণাটিকে প্রচার করেছিলেন। 1956 সালে শুরু হওয়া শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি প্রধান দাবি ছিল: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তাদের নিজ নিজ মতাদর্শ যুদ্ধ ছাড়াই একসাথে সহাবস্থান করতে পারে। এর তিনটি উপাদান ছিল : স্বদেশে সো) একটি দেশে সমাজতন্ত্রভিত্তিক সম্পদের মোট প্রতিশ্রুতি, 1924 সালে স্ট্যালিন প্রথম

প্রবর্তন করেছিলেন(; আয়রন কার্টেন কমিউনিস্ট বিশ্বের মানুষকে পুঁজিবাদী বিশ্বের মানুষের কাছ)
(থেকে বন্ধ করে দেওয়া; এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতা রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রতিস্থাপন সামরিক শক্তির)
ক্রুশ্চে ।(সাথে যুক্তি দিয়েছিলেন যে যখন সমাজতন্ত্র শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদের উপর বিজয়ী হবে
তখন এটি যুদ্ধ ছাড়াই ঘটবে, যা প্রয়োজনীয় বা অনিবার্যও নয় ।

আলবেনিয়ান দূতাবাসে বক্তৃতায় ক্রুশ্চেভ 1957 সালের প্রথম দিকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মতবাদ
ব্যাখ্যা করেছিলেন । 1960 সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এক ভাষণে , ক্রুশ্চেভ এই নীতির
উপর জোর দিয়েছিলেন: “ সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ এবং সোভিয়েত সরকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে
সম্পর্কের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিগুলিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে
চেষ্টা করছে । ... শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি আলোচনা এবং যুক্তিসঙ্গত সমঝোতার মাধ্যমে বলপ্রয়োগ
ছাড়াই সমস্ত অসামান্য সমস্যা সমাধানের জন্য একটি প্রস্তুতি গ্রহণ করে । নীতির পিছনে যুক্তি ছিল
ক্রুশ্চেভের লক্ষ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে পশ্চিমকে " ধরে ও ছাড়িয়ে যাওয়া " এবং এর মাধ্যমে সোভিয়েত
ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা । 31 অক্টোবর, 1959 তারিখে সুপ্রিম সোভিয়েতের কাছে একটি বক্তৃতায়,
ক্রুশ্চেভ ব্যাখ্যা করেছিলেন যে দুটি ব্যবস্থা, কমিউনিস্ট এবং পুঁজিবাদীর মধ্যে বিরোধ অবশ্যই সমাধান
করা উচিত এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই মানব সমাজের উপর ভিত্তি করে এই লক্ষ্যে একটি বাস্তব
পদ্ধতি ।

বিখ্যাত আমেরিকান জার্নাল ফরেন অ্যাফেয়ার্সে 1959 সালের একটি নিবন্ধে ক্রুশ্চেভ আমেরিকান
পাঠকদের সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশদ প্রকাশের প্রস্তাব দিয়েছেন এবং বজায় রেখেছেন যে
সোভিয়েত ইউনিয়ন 1917 সালে বিপ্লবের পর তার সৃষ্টির পর থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির
দাবি করে: " এর শুরু থেকেই, " ক্রুশ্চেভ যুক্তি দিয়েছিলেন, “ সোভিয়েত রাষ্ট্র তার পররাষ্ট্র নীতির
মূল নীতি হিসাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ঘোষণা করেছিল । এটা কোন দুর্ঘটনা ছিল না যে সোভিয়েত
শক্তির প্রথম রাষ্ট্রীয় কাজটি ছিল শান্তির ডিক্রি, রক্তাক্ত যুদ্ধ বন্ধের ডিক্রি ” (ক্রুশ্চেভ 1959, পৃ .1)।
ক্রুশ্চেভ জেনেভা শীর্ষ সম্মেলনের মতো আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে
এবং 1959 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাম্প ডেভিড পরিদর্শনের মতো আন্তর্জাতিক ভ্রমণের মাধ্যমে
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছিলেন ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন শিল্পোন্নত দেশগুলির সাথে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণাটি প্রয়োগ করে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্ক এবং উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (ন্যাটো) এবং ওয়ারশ চুক্তির সদস্য দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক (পূর্বে কমিউনিস্ট ব্লক নামেও পরিচিত)।

পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না এর ব্যাখ্যা: 1960 এবং 1970 এর দশকে চীন উন্নয়নশীল বিশ্বের অসামাজিক দেশগুলির সাথে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণাটি প্রয়োগ করেছিল এবং যুক্তি দিয়েছিল যে "সাম্রাজ্যবাদী" পুঁজিবাদী দেশগুলির প্রতি একটি বিদ্রোহী মনোভাব বজায় রাখা উচিত। 1980 এর দশকের গোড়ার দিকে চীন পুঁজিবাদী দেশগুলি সহ সমস্ত দেশের সাথে তার সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণার ব্যাখ্যাকে প্রসারিত করেছিল।

1953 সালের ডিসেম্বরে, তিব্বত নিয়ে ভারতের সাথে আলোচনার সময়, চীনা প্রধানমন্ত্রী ঝোউ এনলাই (1898 - 1976) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঁচটি নীতি প্রস্তাব করেছিলেন। এগুলি চীন-ভারত - যুদ্ধের পরে 1954 সালের এপ্রিল মাসে ঝোউ এনলাই এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দ্বারা স্বাক্ষরিত চীন ও ভারতের তিব্বত অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য ও আন্তঃসংযোগ সম্পর্কিত গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এবং ভারতের প্রজাতন্ত্রের মধ্যে চুক্তিতে লেখা হয়েছিল। তিব্বতে। 1954 সালে জুন 1954 সালে Zhou এর দুই দেশ সফরের সময় ভারত ও মায়ানমারের প্রধানমন্ত্রীদের সাথে জারি করা যৌথ ঘোষণায় এবং আবার 1955 সালের বান্দুং সম্মেলনে, এশীয় ও আফ্রিকানদের প্রথম সম্মেলন থেকে পাঁচটি নীতির পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। দেশ, যেখানে তারা সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভুক্ত ছিল। 1982 সালে পাঁচটি নীতি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধানে লিখিত হয়েছিল যেমনটি সমস্ত সার্বভৌম জাতির জন্য প্রয়োগ করা হয়েছিল। চীন কর্তৃক প্রচারিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঁচটি নীতি হল:

1. সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা
2. পারস্পরিক আত্মসন
3. একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা
4. সমতা
5. পারস্পরিক সুবিধা

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চীনা ধারণার তিনটি উল্লেখযোগ্য পরিণতি রয়েছে, যেমনটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সোভিয়েত ধারণা থেকে আলাদা। প্রথমত, চীনা ধারণার মধ্যে রয়েছে মুক্ত বাণিজ্য সম্প্রসারণ। দ্বিতীয়ত, চীনা ধারণা জাতীয় সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার উপর জোর দেয়; এইভাবে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রচারে আমেরিকান পদক্ষেপগুলিকে শত্রুতামূলক কর্ম হিসাবে দেখা হয়। তৃতীয়ত, ধারণাটি অন্যান্য দেশে কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের সমর্থনকে বাধা দেয়। এই নীতির একটি প্রধান পরিণতি ছিল চীন দক্ষিণপূর্ব এশিয়া-, বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ায় কমিউনিস্ট বিদ্রোহকে সমর্থন করবে না এবং সেই দেশগুলিতে বিদেশী চীনাদের থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চীনা ধারণা তাইওয়ান পর্যন্ত প্রসারিত নয়, যা চীনের একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এইভাবে একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় যেখানে অন্যান্য দেশ, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণা চীনা পররাষ্ট্রনীতির একটি অংশ হিসেবে রয়ে গেছে। ৩শে সেপ্টেম্বর, ২০০৫-এ, চীনের প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও একে অপরের শক্তির প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন সভ্যতার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে উন্নীত করার আহ্বান জানান।

Session 08.

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বা আমার বিল-মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার (আরবি: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, প্রতিবর্ণীকৃত: আল আম্র বিল মা'আরুফ ওয়া আননাহয়ি আন আলমুনকার) হলো ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য। ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ কুরআনে বিষয়ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, হে লোক সকল তোমরা তোমরা তোমার অনুসারীদের সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজের নিষেধ কর। এবং অন্যকে সরল পথ অবলম্বন করতে এবং নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন কর।

ভালো কাজের আদেশ করা এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করা

কুরআনে মারুফ ৩৯টি আয়াতে এবং মুনকার ১৬টি আয়াতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, আক্ষরিক অর্থে "এমর বিল মারুফ, নেহি আন মুনকার" ৯ বার উল্লেখ করা হয়েছে। মারুফ ও মুনকার ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় কারণ কুরআন এই ধারণার মাধ্যমে বিশ্বাসীদের উপর যে দায়িত্ব আরোপ করে। মারুফকে কুরআনের নৈতিক বোঝার একটি মূল শব্দ হিসেবে দেখা হয় এবং প্রথাগত ভাষ্যকাররা মারুফের সাথে এর পরিচিতিমূলক (উরুফ)এর অর্থ প্রথার বিরোধিতা করেন।

যদিও শব্দগুচ্ছের সবচেয়ে সাধারণ অনুবাদ হল " ভাল এবং মন্দ ",তবে ইসলামী দর্শন দ্বারা ভাল এবং মন্দ বক্তৃতা নির্ধারণে ব্যবহৃত শব্দগুলি হল "হুসন" এবং "কুবহ"। এর সবচেয়ে সাধারণ ব্যবহারে, মারুফ হল "প্রথা অনুসারে", অন্যদিকে মুনকার, যার প্রথার কোন স্থান নেই, তার বিপরীত, একবচন (নুকর)। আজকের ধর্মীয় অভিব্যক্তিতে, মারুফ সুন্নাহ (প্রথম দিকে এই ধারণাটি প্রথা থেকে আলাদা ছিল না,মুনকারকে বিদ'আ বলা হয়।(একটি সম্পর্কিত বিষয়: ইস্তিহসান)

এই অভিব্যক্তিটি হল হিবাহের ধ্রুপদী ইসলামী প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি - ইসলামী আইনের হস্তক্ষেপ এবং প্রয়োগ করা ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক কর্তব্য (আইনের ইসলামিক স্কুলের উপর নির্ভর করে) । এটি মুসলমানদের জন্য ইসলামী মতবাদের একটি কেন্দ্রীয় অংশ গঠন করে। বারোটি শিয়া ইসলামের দশটি আনুষঙ্গিক বা বাধ্যতামূলক আইনের মধ্যে দুটি আদেশও গঠন করে ।

কিছু আইনবিদ তাদের শরীয়তের উপলব্ধি অনুসারে মানুষের আচরণকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন এবং এই আহকাম বোঝাপড়াটি কে "সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব" এর অংশ করেছেন। সুতরাং, ইসলামী ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও উপলব্ধির (ফিকাহ ও আহকাম) উপর ভিত্তি করে ভালো এবং মন্দের সংজ্ঞার অর্থ হল, তত্ত্বগতভাবে, আল্লাহ যা ভালো দেখেন তা ভালো এবং আল্লাহ যা খারাপ দেখেন তা মন্দ। আধুনিক সময়ে ইসলাম ধর্মের গোষ্ঠীগুলি বেসামরিক সংস্থা (ফাউন্ডেশন, অ্যাসোসিয়েশন, রাজনৈতিক দল , ইত্যাদি) থেকে শুরু করে টাস্ক গ্রুপ গঠন করেছে যেগুলির লক্ষ্য এই বোঝাপড়া এবং সমাজে শরিয়ার পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত একটি সামাজিক কাঠামো অর্জন করা,সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তি ও সহিংসতা ব্যবহার করা বৈধ বলে মনে করে।

প্রাক-আধুনিক ইসলামী সাহিত্য বর্ণনা করে যে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা (সাধারণত পণ্ডিতরা) নিষিদ্ধ বস্তু, বিশেষ করে মদ এবং যারা মনে করেন যে নির্দিষ্ট ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম, ধ্বংস করে অন্যায়কে হারাম করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছেন। সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বে,বিভিন্ন রাষ্ট্র বা প্যারাস্ট্যাটাল সংস্থা (প্রায়শইতাদেরশিরোনামে"পুণ্যের প্রচার এবং পাপের প্রতিরোধ"এর মতো

বাক্যাংশ) ইরান , সৌদি আরব ,নাইজেরিয়া , সুদান , মালয়েশিয়াতে আবির্ভূত হয়েছে। ইত্যাদি, বিভিন্ন সময়ে এবং ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরের সাথে, পাপমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং পুণ্যবানদের বাধ্য করা। তবে, সৌদি কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ইসলামে প্রকাশ্যে নারী-পুরুষ সহাবস্থান করতে পারে। তারা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কনসার্ট এবং ক্রীড়া ইভেন্টের আয়োজন করে পথ প্রশস্ত করেছিল।

মুসলিমদের একটি দল থাকবে যারা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে:
 وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম। (০৩. আলে ইমরান ১০৪)

تَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ
 তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। (০৩. আলে ইমরান ১১০)

রাসুলের অনুসারীদের কাজ হল সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করা:
 الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ۚ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

যারা অনুসরণ করে রাসুলের, যে উম্মী নবী; যার গুণাবলী তারা নিজদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎ কাজ থেকে। (০৭. আরাফ ১৫৭)

সৎকর্মে সহযোগিতা করার নির্দেশ:

وَتَعَاوَا عَالًا ۚ الْبِرَّ وَالتَّقْوَى ۚ وَلَا تَعَاوَا عَالًا ۚ الْإِثْمَ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর। (মায়দাহ ০২)

সন্তানের প্রতি লুকমান আ. এর উপদেশ:

يٰۤاِبْنُ ۤاٰدَمَ ۙ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَالًا ۚ مَا اَصَابَكَ ۙ ۙ ذٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ

হে আমার প্রিয় বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (৩১. লুকমান ১৭)

কিয়ামতের দিন অনু পরিমান ভাল এবং মন্দ কাজের পরিণাম দেওয়া হবে:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

অতএব, কেউ অণু পরিমাণ ভালকাজ করলে তা সে দেখবে, আর কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তাও সে দেখবে। (৯৯. যিলযাল ৭-৮)

মন্দ কাজে নিষেধ না করার পরিণতি:

لُعِنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে দাউদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখে লা'নত করা হয়েছে। তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ থেকে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত, তা কতইনা মন্দ! (০৫. মায়েদা ৭৮-৭৯)

মুনাফিকরা মন্দ কাজের আদেশ দেয় এবং ভাল কাজ থেকে নিষেধ করে:

الْمُفْسِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ

মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা একে অপরের অংশ, তারা মন্দ কাজের আদেশ দেয়, আর ভাল কাজ থেকে নিষেধ করে, তারা নিজদের হাতগুলোকে সঙ্কুচিত করে রাখে। (০৯. তওবা ৬৭)

মুমিনরা ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে:

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ يُؤْتِمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَنَرْحَمُهُمُ ۚ اللَّهُ ۚ اللَّهُ عَزِيزٌ ۚ حَكِيمٌ

আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (০৯. তওবা ৭১)

الَّتَائِبُونَ الْعَبْدُونَ الْحَمْدُونَ السَّائِحُونَ الرُّعُوفَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحَفِظُونَ لِخُدُودِ اللَّهِ ۚ وَ بَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

তারা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হেফাযতকারী। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও। (০৯. তওবা ১১২)

রাষ্ট্র প্রধানদের দায়িত্ব হল সৎ কাজে আদেশ করা এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা:

الَّذِينَ مَكَّنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে। (২২. হজ্জ ৪১)

আল-হাদিস

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ না করার পরিণতি:

عَنْ ذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَلِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " وَالَّذِي فُسِّيَ بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوَنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ " .

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের জন্য আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের উপর তার শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তোমরা তখন তার নিকট দু'আ করলেও তিনি তোমাদের সেই দু'আ গ্রহণ করবেন না। (তিরমিজি ২১৬৯, মিশকাত ৫১৪০)

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ أَتَيْهَا النَّاسُ أَكُمُ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ إِلَّا إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) وَلَئِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ

আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হে লোকসকল! তোমরা তো অবশ্যই এই আয়াত তিলাওয়াত করে থাকঃ “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদেরই কর্তব্য তোমাদেরকে সংশোধন করা। যদি তোমরা সৎপথে থাক তাহলে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না” (মায়েরা ১০৫)। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ মানুষ যদি কোন অত্যাচারীকে অত্যাচারে লিপ্ত দেখেও তার দুহাত চেপে ধরে তাকে প্রতিহত না করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা অতি শীঘ্রই তাদের সকলকে তার ব্যাপক শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত করবেন। (তিরমিজি ২১৬৮)

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رِبْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ لَا يُغَيَّرُوا إِلَّا أَعَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ " .

জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে পাপাচার হতে থাকে এবং তাদের প্রভাবশালী ব্যক্তির ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের পাপাচারীদের বাধা দেয় না, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ব্যাপকভাবে শাস্তি পাঠান। (ইবনে মাজাহ ৪০০৯, আবু দাউদ ৪৩৩৯)

হাত অথবা মুখ অথবা অন্তর দ্বারা হলেও অন্যায় প্রতিহত করতে হবে:

عَنْ أَرَقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَوْ قَالَ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرَّوً فَقَامَ رُلٌ فَقَالَ لِمَرَّوً خَالَفْتَ السُّنَّةَ فَقَالَ يَا فُلَانُ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُنْكَرْهُ بِيَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَكْبَرُ عَفْوِ الْإِيمَانِ " .

তারিক ইবনু শিহাব (রহ.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মারওয়ান ঈদের নামাযের পূর্বে সর্বপ্রথম খুতবাহর প্রচলন করেন। তখন কোন একজন লোক এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে মারওয়ানকে বলেন, আপনি তো সুন্নাত (বিধান) পরিপন্থী কাজ করলেন। মারওয়ান বলল, হে মিয়া! ঐ পন্থা এখানে বাতিল হয়ে আছে। আবু সাঈদ (রা.) পরবর্তীতে বলেন, এ প্রতিবাদকারী তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যদি তোমাদের মধ্যে কোন লোক কোন অন্যায় সংঘটিত হতে দেখে তাহলে সে যেন তার হাত দ্বারা (ক্ষমতা প্রয়োগে) তা প্রতিহত করে। যদি এই যোগ্যতা তার না থাকে সে যেন তার মুখ দ্বারা তা প্রতিহত করে। যদি এই যোগ্যতাও তার না থাকে তাহলে সে যেন তার অন্তর দ্বারা তা প্রতিহত করে (অন্যায়কে ঘৃণা করে)। আর এটা হলো দুর্বলতম ঈমান। (তিরমিজি ২১৭২, ইবনে মাজাহ ৪০০৫)

স্বৈরাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنْ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةً عَدُوٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ إِنْ

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হচ্ছে স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায্য কথা বলা। (তিরমিজি ২১৭৪)

কারো ভয়ে সত্য বলা থেকে বিরত থাকা নিষেধ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ خَطِيبًا فَكَأَنَّ فِيمَا قَالَ " أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَوْ يَقُولُ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ " . قَالَ فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ قَدْ وَ اللَّهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهَبْنَا .

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন এবং তাঁর ভাষণে বলেনঃ সাবধান! মানুষের ভয় যেন কোন ব্যক্তিকে সজ্ঞানে সত্য কথা

বলতে বিরত না রাখে। রাবী বলেন (এ হাদীস বর্ণনাকালে) আবু সাঈদ (রাঃ) কেঁদে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা বহু কিছু লক্ষ্য করেছি কিন্তু বলতে ভয় পাচ্ছি। (ইবনে মাজাহ ৪০০৭)

সর্বনিম্ন স্তরের মুমিন ব্যক্তি সে যে অন্তর দিয়ে জিহাদ করে:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ بِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَتْ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ وَارِثُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ أَهْدَاهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ أَهْدَاهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ أَهْدَاهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ بَعْدُ خَرَدٍ»

ইবনু মাস্'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নবীকে তাঁর উম্মাতের মধ্যে পাঠাননি, যার উম্মাতের মধ্যে কোন সাহায্যকারী বা সাহাবীর দল ওই উম্মাতে ছিল না। এ তারা সুন্নাহের পথ অনুসরণ করেছে, তার হুকুম-আহকাম মেনে চলেছে। তারপর এমন লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা অন্যদেরকে যা বলতো নিজেরা তা করতো না। আর তারা সে সব কাজ করতো যার আদেশ (শারী'আতে) তাদেরকে দেয়া হয়নি। (আমার উম্মাতের মধ্যেও এমন কতিপয় লোক থাকতে পারে)। তাই যে নিজের হাত দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সে (পূর্ণ) মু'মিন। আর যে মুখের দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। আর যে অন্তর দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। আর এরপর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই। (মুসলিম ৫০, মিশকাত ১৫৭)

আর মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং রসূল (সা.) ও এবিষয়ে মনুষ্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাই কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমান যদি কোনো মন্দ কাজ দেখে সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিবাদ না করে এবং ভাল কাজে আদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকে তাহলে সে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করার কারণে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক শাস্তির সম্মুখীন হবে। অতএব, আসুন মানুষকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করি- মন্দ কাজ দেখলে প্রতিবাদ করি, শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ি।

Session 09.

স্বাস্থ্য সচেতনতা

স্বাস্থ্য সচেতনতা হলো কিছু অভ্যাসের আচরণ, যার দ্বারা আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারি। 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'- এটি একটি বহু পরিচিত বাক্য। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য সচেতনতা দরকার।

দৈনন্দিন কাজ কর্মে স্বাস্থ্য সচেতনতা।

খাদ্যাভ্যাসে স্বাস্থ্য সচেতনতা।

অসুখ নিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা।

আচার আচরণে স্বাস্থ্য সচেতনতা।

দৈনন্দিন কাজ কর্মে স্বাস্থ্য সচেতনতায় থাকবে পরিশ্রুত পানীয় জল পান করা, শৌচের পরে ও খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া। স্বাস্থ্যবিধিসম্মত শৌচাগার ব্যবহার করা। ইত্যাদি।

খাদ্যাভ্যাসে স্বাস্থ্য সচেতনতায় থাকবে ক্ষতিকর খাদ্য ও পানীয় ব্যবহার না করা। মাদক সেবন থেকে দূরে থাকা। ভেজাল খাদ্য নিয়ে সচেতন থাকা।

অসুখ নিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতায় উল্লেখ করা যায় অসুখের কারণ জানা। অসুখের সময় পথ্যের ব্যবহার ভুল ধারণা আছে, সেখান থেকে মুক্ত থাকা। অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ওষুধ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা। যুক্তিযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন দরকার।

আচার আচরণে স্বাস্থ্য সচেতনতায় বলা যায় পরিবেশকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখা। যত্র তত্র আবর্জনা না ফেলা। সামাজিক জীবনযাপন করা। পরিবেশকে নির্মল রাখার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো

১) বাতাসের মান বজায় রাখা। বাতাসে কার্বনের পরিমাণ কমানো।

২) ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ জলকে দূষণমুক্ত রাখা।

৩) বিষাক্ত বস্তু ও বিপজ্জনক বর্জ্য সংস্পর্শ এড়ানো।

সুস্থতার জন্যে যা করণীয়

জীবনধারায় পরিবর্তন ও খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করতে নতুন বছরের শুরুটা হতে পারে দারুণ সময়। যদিও খুব অল্প সংখ্যক মানুষ তাদের সংকল্পে অটল থাকতে পারেন, তবুও নতুন বছরে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্যে নেওয়া যেতে পারে বেশ কিছু সংকল্প।

ওজন কমান

উচ্চতা অনুযায়ী আপনার ওজন যদি বেশি হয়ে থাকে, তাহলে সুস্বাস্থ্যের জন্য ওজন কমানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওজন কমানোর সঙ্গে সঙ্গে হৃদরোগ, টাইপ-২ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপের মতো রোগের ঝুঁকি কমেতে শুরু করে। ওজন কমাতে চাইলে স্বাস্থ্যকর খাবার খান ও নিয়মিত ব্যায়াম করুন।

স্বাস্থ্যকর খাবার

স্বাস্থ্যকর খাবারের সঙ্গে ২টি বিষয় জড়িত। প্রথমত, কী খাচ্ছেন এবং দ্বিতীয়ত, কীভাবে খাচ্ছেন। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ফল ও শাক-সবজি থাকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ফল ও শাক-সবজিতে ক্যালোরি ও চর্বি কম থাকে, ফাইবার বেশি থাকে এবং এগুলো ভিটামিন ও খনিজের ভালো উৎস। ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার ওজন কমাতে সাহায্য করে।

অলস শুয়ে-বসে থাকা কমান

নিয়মিত ব্যায়াম করার পাশাপাশি শরীরকে সার্বক্ষণিক সক্রিয় রাখার জন্য অলসভাবে শুয়ে-বসে সময় কাটানো এড়িয়ে চলা উচিত। দৈনন্দিন কাজে ছোট ছোট কিছু পরিবর্তন আনার মাধ্যমেই যা সম্ভব।

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা

প্রতি বছর নিয়মিত চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। এতে করে ছোটখাট স্বাস্থ্য সমস্যা বড় আকার ধারণের আগেই শনাক্ত ও প্রতিরোধ করা সম্ভব। শারীরিকভাবে সুস্থ বোধ করলেও প্রতি বছর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে ভুলবেন না।

মানসিক চাপ কমান

মানসিক চাপ কমানোর উপায় জানা মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অতিরিক্ত চাপ অনুভব করলে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম, হাঁটা বা গান শোনার মতো সাধারণ কাজগুলো সহায়ক হতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ওপর প্রভাব ফেলে। তাই এর থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় বের করার কোনো বিকল্প নেই।

পর্যাপ্ত ও ভালো ঘুম জরুরি

ভালো ঘুম রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ও মানসিক সুস্থতা বাড়ায়। আরামদায়ক ঘুমের জন্য রুটিন তৈরি, ঘুমানোর আগে মোবাইল বা টেলিভিশন দেখার সময় কমানো এবং ভালো ঘুমের পরিবেশ তৈরি প্রয়োজনীয় বিষয়। যদি অনিদ্রার সমস্যা থাকে, তাহলে মানসিক চাপ কমানোর উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

সংকল্প বাস্তবায়ন

সুস্থ থাকার জন্য যেসব সংকল্প গ্রহণ করবেন, বছরজুড়ে তার বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে যায়। কাজেই জীবনযাত্রার সঙ্গে মানানসই সংকল্প নির্ধারণ করে তা নিয়মিত মেনে চলা উচিত। এতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। স্বাস্থ্যকর নতুন অভ্যাস তৈরি করতে সময় ও ধৈর্য শক্তি প্রয়োজন।

সংকল্পের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন: ওজন কমাতে চাওয়ার বদলে ঠিক কতটা ওজন কমানো প্রয়োজন বা কতটা ওজন কমাতে চান, তা নির্ধারণ করুন। ব্যায়াম করতে চাওয়ার বদলে সপ্তাহে প্রতিদিন ৩০ মিনিট ব্যায়াম করার লক্ষ্য নির্ধারণ করুন।

নিজেকে সুস্থ রাখার সহজ উপায়

গবেষণায় দেখা গেছে, আজীবন সুস্বাস্থ্যের গোপণ চাবিকাঠি হল ‘লাইফস্টাইল মেডিসিন’। যা খুবই সহজ। কেবলমাত্র আপনার ডায়েটে কিছু স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন আনুন এবং নিয়মিত ব্যায়াম করুন। সেই সঙ্গে কীভাবে নিজেকে স্ট্রেস ফ্রি রাখতে পারবেন সেটা শিখুন।

আপনার সুস্বাস্থ্য (Healthy lifestyle) কীভাবে বজায় রাখবেন তার সঠিক পদ্ধতি বেছে নেওয়া জরুরি। সেটা আদর্শগতভাবে আত্ম-আবিষ্কার এবং শেখার যাত্রা হওয়া উচিত। পড়ুন এবং দেখুন কোনটি আপনার জন্য কার্যকরী।

ব্যায়াম

নিয়মিত শরীরচর্চা বার্ষিক্য ঠেকাতে পারে। এটি দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে, রক্তচাপ স্বাভাবিক করে, চর্বিহীন পেশী উন্নত করে, কোলেস্টেরল কমা এং হাড়ের ঘনত্ব উন্নত করে। আপনার বাড়ির চারপাশে জগিং করুন, বাড়ির বা প্রতিবেশীর বাচ্চাদের সঙ্গে পার্কে হাঁটুন, লাফ দড়ির অভ্যাস করুন বা খেলাধুলো করুন, হাইকিং পছন্দ হলে সেটাও করতে পারেন। ব্যায়াম আপনার শরীরে এন্ডোরফিন (endorphins) রিলিজ করে, যা সামগ্রিকভাবে আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাকে বাড়ায়। এইভাবে নিয়মিত ব্যায়াম শুধু আপনাকে শারীরিকভাবে ফিট থাকতে সাহায্য করে না, বরং আপনার বিষণ্ণতা, উদ্বেগ এবং মানসিক অসুস্থতার ঝুঁকিও কমায়।

সঠিক খাবার খান

সারাদিনে অন্তত পাঁচটি সবজি আপনার খাদ্য তালিকায় রাখুন। সেগুলি আপনি আপনার পছন্দমতো, কাঁচা, সেদ্ধ বা ভাজা করে খেতে পারেন।

ডায়েটে শাকসবজির পরিমাণ বেশি হলে তা ফুসফুস, কোলন, স্তন, জরায়ু, খাদ্যনালী, পাকস্থলী, মূত্রাশয়, অগ্ন্যাশয় এবং ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি কমায়। সঠিক খাবার আপনার ওজন ঠিক রাখবে, লক্ষ্যে স্থির রাখবে এবং লালসা এড়াতে সাহায্য করবে। আপনার খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিন ঠান্ডা পানীয়, ক্যান্ডি, চিপসের মতো প্রক্রিয়াজাত খাবার।

পর্যাপ্ত জল খান

শরীরের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে পর্যাপ্ত জল খাওয়া খুবই প্রয়োজন। জল ডিটক্সিফাই করে, হজমে সাহায্য করে, কেমোথেরাপির ফলাফলে সাহায্য করে, প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, পেশীকে শক্তি জোগায় এবং শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

নিয়মিত ডাক্তারের কাছে যান

আপনি পুরোপুরি সুস্থ বোধ করলেও আপনার শরীর সুস্থ আছে তো? নিজের জন্য সময় বের করে অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখুন।

এটি যে কোনও রোগের প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে, পাশাপাশি ডাক্তারের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করে, আপনার স্বাস্থ্যের ঝুঁকি কম করে, আপনার শরীরকে নিয়ন্ত্রণে রাখে

শরীরের সঠিক ওজন বজায় রাখুন

যদিও সকলের শরীরের আকার, আয়তন, ওজন এক নয়, তবে আপনার শরীরের ওজন ঠিক আছে কিনা জানার সহজ উপায় হল বডি মাস ইনডেক্স (body mass index)। 18.5 এবং 22.9 রেঞ্জের মধ্যে BMI হল আদর্শ।

রাতে ভালো ঘুমান

বিশ্রাম এবং মেডিটেশন, ঘুমানোর আগে এক গ্লাস উষ্ণ দুধ আপনাকে রাতে ভালো ঘুমাতে সাহায্য করতে পারে।

ঘুমাতে যাওয়ার ঠিক আগেই খাবার খাবেন না, শোবার ঘর অন্ধকার রাখুন এবং সমস্ত স্ট্রেস ঝেড়ে ফেলে ঘুমাতে যান। অপ্রয়োজনীয় বিভ্রান্তি থেকে নিজেকে দূরে রাখাই ভালো।

অ্যালকোহল পান করবেন না

অ্যালকোহল শরীরে টক্সিনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, হৃদপিণ্ড এবং ফুসফুসের গতি অনিয়মিত করে তোলে, মস্তিষ্ক নিজেকে ত্বরান্বিত করে এবং লিভার এটিকে বিপাক করার চেষ্টা করে ওভারড্রাইভ

করে। এগুলি ছাড়াও আরও খারাপ দিক রয়েছে যা মানসিক স্বাস্থ্য, শরীরের ওজন, ঘুমের ওপর প্রভাব ফেলে। অ্যালকোহল শরীরে ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

টোব্যাকো বা তামাকজাতীয় জিনিস থেকে দূরে থাকুন

ধূমপান বন্ধ করা কঠিন ঠিকই, কিন্তু আপনি একবার নিজেকে প্রশ্ন করুন তো, আপনি কী নিজের থেকে এটিকে বেশি ভালোবাসেন? নিশ্চয় নয়! ধূমপান হল ক্যান্সারের অন্যতম কারণ যা চাইলে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। পুরুষদের মধ্যে ক্যান্সারের 50% ধূমপানের সঙ্গে সম্পর্কিত।

আপনার যদি এই অ্যাস ছাড়তে সমস্যা হয় তাহলে কাউন্সিলিংয়ের সাহায্য নিতে পারেন। কেন আপনার ধূমপান ছেড়ে দেওয়া উচিত সে বিষয়ে আপনি আরও পড়তে এখানে ক্লিক করুন

ঘরে রান্না করুন এবং বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন

আজকাল আমরা সকলেই খুব ব্যস্ত। তাই চেষ্টা করুন সহজ সিম্পল খাবার রান্না করে খেতে। তাতে সময়ও বাঁচবে আবার শরীরের জন্য উপকারীও হবে। প্রয়োজনে ছুটির দিনে একবার বসে সপ্তাহের খাবার মেনু ঠিক করে নিন, তাতে আপনার সুবিধে হবে। পূর্ব পরিকল্পনা আপনাকে অতিরিক্ত ফ্যাট, চিনি এবং নুনযুক্ত খাবার এড়াতে সাহায্য করবে এবং আপনাকে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর রাখে।

স্বাস্থ্যকর স্ন্যাক্স খান

আমরা অনেকেই জানি, যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ট্রান্স ফ্যাট উভয়ই আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকারক। আপনি খাদ্য তালিকায় অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার রাখতে পারেন। যা কার্ডিওভাসকুলার রোগ এবং দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার ঝুঁকি কমাতে পারে। দুধ, ডিম এবং পনির থেকেও ওমেগা-3 পেতে পারেন।

কৃতজ্ঞ হন

সুস্থ থাকতে কৃতজ্ঞতা বোধ গড়ে তোলা হল অন্যতম উপেক্ষিত হাতিয়ার। এটি শারীরিক এবং মানসিক উভয় স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়, সহানুভূতি বাড়ায়, আগ্রাসন হ্রাস করে, মানসিক শক্তি এবং আত্মসম্মান বোধ উন্নত করে। যা নতুন সম্পর্কে দরজাও খুলে দেয়।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মহানবী (সা.)-এর ৬ নির্দেশনা

একজন প্রকৃত মুমিন কখনো স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না। কেননা শক্তিবান ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মুমিন আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি প্রিয়। রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘দুর্বল মুমিনের তুলনায় সবল মুমিন অধিক কল্যাণকর এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ

রয়েছে। আর যা তোমাকে উপকৃত করবে, সেটিই কামনা করো।' (মুসলিম, হাদিস : ২৬৬৪)
হাদিসের আলোকে স্বাস্থ্য সুরক্ষার কয়েকটি দিক এ লেখায় আলোচনা করা হলো;

দাঁতের যত্ন : সুস্থতার জন্য দাঁত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার রাখা, দাঁতের ময়লা ও দুর্গন্ধ দূর করতে সচেষ্ট থাকা জরুরি। রাসুল (সা.) নিয়মিত দাঁতের যত্ন নিতেন। দাঁত যত্নের প্রক্রিয়ায় গাছের শিকড় জাতীয় মিসওয়াক ছিল রাসুল (সা.)-এর একমাত্র মাধ্যম। তিনি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নিয়মিত এই মিসওয়াকের আমল করতেন। রাসুল (সা.) রাত-দিনের যখনই ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন অজুর আগে মিসওয়াক করে নিতেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ৫৭)

শরীরচর্চা কিংবা দ্রুত হাঁটা : সুস্বাস্থ্যের জন্য শরীরচর্চার বিকল্প নেই। যারা কর্মব্যস্ততায় শরীরচর্চার সুযোগ পান না, চিকিৎসকরা তাদের প্রতিদিন নিয়ম করে দ্রুত হাঁটার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। শরীরচর্চার অংশ হিসেবে নবীজি (সা.) সাহাবাদের সঙ্গে কুস্তি লড়েছেন। মাঝেমাঝে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। প্রিয়তম স্ত্রী আয়েশা (রা.)-এর সঙ্গেও এক রাতে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। তিনি সব সময় স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে দ্রুত গতিতে হাঁটতেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, 'আমি নবীজি (সা.)-এর চেয়ে দ্রুতগতিতে কাউকে হাঁটতে দেখিনি।' (তিরমিজি : ৩৬৪৮)

পরিমিত খাবার ও পানি পান : সুস্বাস্থ্যের জন্য বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের বিকল্প নেই। বর্তমান বিশ্বের ডায়েটিশিয়ানরা রোগীদের পরিমিত আহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। নবীজি (সা.) পরিমিত খাবারে অভ্যস্ত ছিলেন। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'পেটের তিন ভাগের এক ভাগ খাবারের জন্য। এক ভাগ পানির জন্য। এক ভাগ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখা।' (তিরমিজি, হাদিস: ২৩৮০)

সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিচ্ছন্নতা : ইসলামে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অনুসঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেন, 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংশ।' (মুসলিম, হাদিস : ২২৩)
তা ছাড়া অপরিচ্ছন্নতা ও নোংরা পরিবেশ শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এর কারণে নানা রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটে শরীরে। তাই অজু ও গোসলের পবিত্রতা অর্জনের পাশাপাশি শরীরের অবাঞ্ছিত কয়েকটি বিষয়ের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৮৮৯)
দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ : সুস্থতা ও অসুস্থতা দুটোই মুমিনের জন্য নিয়ামত। তবে নেকির আশায় ইচ্ছাকৃত অসুস্থতা হওয়া যাবে না। নবী করিম (সা.) তার সাহাবিদের দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছেন এবং তিনি নিজে অসুস্থতার সময় চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার নিরাময়ের উপকরণ তিনি সৃষ্টি করেননি।' (বুখারি, হাদিস : ৫৬৭৮)

পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুম : ঘুম দৈহিক ও মানসিক প্রশান্তি আনে। মস্তিষ্কের উন্নতি ঘটায়। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তাই সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন রাতের পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর ঘুম। চিকিৎসকরা

দেহিতে ঘুমের অভ্যাসকে শরীরের জন্য নানাবিধ জটিল রোগের উৎস বলে থাকেন। হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) এশার নামাজ এক-তৃতীয়াংশ রাত পরিমাণ দেহি করে পড়া পছন্দ করতেন, আর এশার আগে ঘুমানো এবং এশার পর না ঘুমিয়ে গল্পগুজব করা অপছন্দ করতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৯৯)

একজন মুমিনকে যেমনিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবাদতের প্রতি তৎপর থাকতে হবে, তেমনিভাবে যথাযথ ও তৃপ্তিকর ইবাদতের জন্য সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারেও যত্নশীল হতে হবে। এসব নিয়ম মেনে চললে আমাদের শরীর রোগের বিরুদ্ধে আরো ভালো প্রতিরোধ তৈরি করতে পারবে। আর আমরাও একটা সুস্থ জীবনযাপন করতে পারব।

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কী কী করতে পারি?

আমাদের শরীর যখন যে-কোনো ধরনের রোগ-জীবাণু কিংবা ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সেগুলো থেকে শরীরকে রক্ষা করে আমাদের শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা। সুতরাং, যার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যতটা ভালো, তার রোগ-বালাইয়ে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি ততই কম। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার কিছু অংশ আমরা জন্মের সময়ই অর্জন করি আর বাকিটা আমাদের জীবনযাপন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। তাই শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হলে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলা খুব জরুরি। এগুলো হলো:

- ধূমপান এবং যে-কোনো ধরনের নেশাদ্রব্য থেকে দূরে থাকুন। আপনি যদি ধূমপায়ী হোন তবে যে-কোনো রোগে আপনার আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অধূমপায়ীদের থেকে অনেক বেশি।
- স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে। তেল, চর্বি ও বেশি মশলাযুক্ত খাবারের বদলে শাকসবজি, ফলমূল ও আঁশযুক্ত খাবার বেশি খেতে হবে। চিনিযুক্ত খাবার কম খাওয়াই ভালো। চা-কফি অতিরিক্ত না খাওয়াই ভালো।
- প্রতিদিন শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে। নিয়মিত আধাঘণ্টা জোরে জোরে হাঁটা শরীরের জন্য খুব ভালো ব্যায়াম।
- নিজের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
- মানসিক চাপ কমাতে হবে। কাজের পাশাপাশি পরিবার ও বন্ধুদেরকে সময় দেওয়া কিংবা কোনো ধরনের সখের কাজ মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।
- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। উচ্চ রক্তচাপ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে ফেলে।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমাতে হবে। ঘুমের পরিমাণ বয়সের সাথে সাথে কম বেশি হতে পারে। তবে সুস্থ থাকতে হলে প্রতিদিন কমপক্ষে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমানো খুব জরুরি।

- নিজেকে পরিছন্ন রাখতে হবে। বারবার সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া কিংবা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত স্যানিটাইজ করার অভ্যাস সুস্থ থাকার জন্য একটা জরুরি অভ্যাস। চোখ-মুখে হাত দেওয়া, নাক খোঁটা—এই জাতীয় অভ্যাসগুলো ছেড়ে দিতে হবে। যেখানে সেখানে থুতু ফেলার মতো বাজে অভ্যাস বাদ দিতে হবে।

Session-10:

Qualities and skills to develop for effective leadership

(Follow this book:

ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী)

Session-11:

Memorization of verses related to Morality with meaning

- "Be kind, honorable and humble to one's parents," (17:23-24) ;
- "Do not commit adultery," (17:32);
- "Do not kill unjustly," (Surat Al-Ma'idah :32);
- "Be neither miserly nor wasteful," (17:26-29);
- "So establish weight with justice and fall not short in the balance" (Ar-Rahman (9)

Session-12:

Comprehensive Hadiths of prophet about Islam

- ❖ الحلال بين والحرام بين وما بينهما مشتبه (52) Bukhari-al Sahih
- ❖ من سن اسلام المرء تركه مالا يعنيه (At-Tirmidhi 2317, Sunan ibn Majah, Hadith No. 3976)
- ❖ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (10) Bukhari-al Sahih
- ❖ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعلفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتك منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (6011) Muslim Sahih, 258 Bukhari-al Sahih
- ❖ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته (2409) Bukhari Sahih